হার্ডিঞ্জ ব্রিজ উদ্বোধনের সময় এর প্রধান প্রকৌশলী স্যার রবার্ট উইলিয়াম গেইলস আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন-

‘যে সেতু নির্মাণ করে দিয়ে গেলাম, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এ সেতু চিরযৌবনা হয়ে থাকবে।’

আজ উইলিয়াম গেইলস নেই, নেই লর্ড হার্ডিঞ্জ। কিন্তু রয়ে গেছে তাদের অমর কীর্তি। চিরযৌবনা এ সেতু আজও সাক্ষ্য দেয়- গেইল সত্য বলেছিলেন। ২০১৫ সালে শত বছর পূর্ণ করলো হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। কিন্তু আজও দেখে মনে হয় যেন সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত এক সেতু। ১৯১৫ সালের ৪ মার্চ, ব্রিটিশ বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য দিন। হিজ এক্সিলেন্সি দি ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া ‘ব্যারন হার্ডিঞ্জ পেনসুরস্ট’ এলেন পাকশিতে। খুলে দিলেন বাংলার উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগের এক বন্ধ দুয়ার। একদিকে যেমন সৌন্দর্য, অপরদিকে ইতিহাসের সাক্ষী- সবমিলিয়ে এই ব্রিজটি বাংলার ঐতিহ্য এবং তাৎপর্য বহন করছে এশিয়ার অন্যতম দীর্ঘ রেলসেতু এ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ।

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশীতে এই ব্রিজের অবস্থান। পাকশী স্টেশনের দক্ষিণে প্রমত্ত পদ্মা নদীর উপর লালরঙা এই ব্রিজটি দাঁড়িয়ে আছে। এর অপরপ্রান্তে রয়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা। ১৮৮৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার সাথে আসাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এজন্য সর্বপ্রথম ১৮৮৯ সালে ব্রিজটি নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ ১৯ বছর পর ব্রিজটি নির্মাণের জন্য মঞ্জুরী লাভ করে। ব্রিজটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রিটিশ প্রকৌশলী স্যার রবার্ট উইলিয়াম গেইলসকে। ব্রিটিশ সরকার তাকে এই ব্রিজ নির্মাণের স্বীকৃতিস্বরুপ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে।

ব্রিজটির নকশা প্রণয়ন করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি আলেকজান্ডার মেয়াডোস রেন্ডেল। ব্রেথওয়েইট অ্যান্ড কার্ক নামক ব্রিটিশ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ব্রিজটির নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯০৯ সালে ব্রিজ নির্মাণের জন্য সার্ভে শুরু হয়। তখন পদ্মা ছিল ভরা যৌবনা। রবার্ট উইলিয়াম গেইলস বুঝতে পারেন- ব্রিজের নির্মাণ তার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে। এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেন মূল ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করাই আগেই নদী-রক্ষা বাঁধ তৈরি করতে হবে। ১৯১০-১১ সালের পুরোটা সময় জুড়ে শুধু বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রে গেইলস এক অসাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি বৃহদাকৃতির পাথর আর মাটি একত্রে মিশিয়ে নদীর পাড়ে ফেলতে থাকেন। দুই পাড়ে প্রায় পনের কিলোমিটার জুড়ে এভাবে বাঁধ দেন। ধারণা করা হয়, নদী বাধতে যে পাথর ব্যবহার হয়েছে তা দিয়ে আরো কয়েকটি ব্রিজ নির্মাণ করা যেত। গেইলসের সেই পদ্ধতি সত্যিই কাজে লেগেছিল। একশ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেই বাঁধ এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। যেন একটা পাথরও এখনও খসে পড়েনি।

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পুরোদমে কাজ চলছে, তখন এখানে কর্মী ছিলেন সর্বমোট ২৪ হাজার ৪শ’ জন। হয়। সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা তৎকালীন সর্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে। ১৯১৫ সালের নববর্ষের দিনই (১ জানুয়ারি ১৯১৫) প্রথম মালগাড়ি দিয়ে চালু করা হয় একটি লাইন। সেই সময় এর নির্মাণে ব্যয় হয় ৩ কোটি ৫১ লাখ ৩২ হাজার ১৬৪ রুপি বা ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ব্রিজ নির্মাণে নদীর নাব্যতার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ফলে এ ব্রিজের জন্য পদ্মার নাব্যতায় কোনো প্রভাব পড়েনি। যদিও ব্রিজের উত্তর দিকের বিরাট অংশ জুড়ে এখন চর। কিন্তু এটি হার্ডিঞ্জের জন্য নয়। ক্ষতি যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ‘লালন শাহ’র জন্য।

সেসময় অনেক ব্রিটিশ নাগরিকের জন্য পাকশীতে গড়ে তোলা হয় বাংলো বাড়ি ও কটেজ। পাকশীতে তখন ব্রিটিশদের অবাধ চলাচল ছিল। রবার্ট উইলিয়াম গেইলসের একটি বড় বাংলো ছিল, যা এখনও টিকে আছে। বলা হয়ে থাকে, প্রায় এক কিলোমিটার দূরের এই বাংলো থেকে তিনি দূরবীন দিয়ে নির্মাণকাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। নির্মাণকাজের সময় পাকশী ও এর আশপাশে ছোটখাট অনেক কলকারখানা, দোকানপাট ও বাজারঘাট গড়ে ওঠে। জনজীবনে প্রভাব পড়েছিল ব্রিটিশ অধিপত্যের। স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয়েছিল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নির্মাণকাজ চলে। অবশেষে ১৯১৫ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়। ব্রিজটির নির্মাণকাজে তৎকালীন হিসেবে ব্যয় হয়েছিল ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার ১ 'শ ৬৪ ভারতীয় রুপি। ১৯১৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রথম পরীক্ষামুলকভাবে ট্রেন ঈশ্বরদী থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপর দিয়ে খুলনা অভিমুখে যাত্রা করে। এরপর একই বছর ৪ঠা মার্চ লর্ড ব্যারন হার্ডিঞ্জ নিজে ফিতা কেটে ব্রিজটি উদ্বোধন করেন।

সংগৃহিত।